



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 428 - 435

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

নাটকে মিথের প্রয়োগ এবং বুদ্ধদেব বসুর 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী'

সুমন ঘোষ

গবেষক, আর.কে.ডি.এফ ইউনিভার্সিটি, রাঁচি

Email ID : ghosh9030@gmail.com

Received Date 25. 06. 2025

Selection Date 20. 07. 2025

Keyword

Buddhadev Bose,
 Drama, Poetic
 Drama, Myth,
 'Tapaswi O
 Tarangini'.

Abstract

The use of myth in the explanation of science, philosophy, religion, religion, ritual, literature, psychology, narrative, social interpretation is a very relevant topic. The first and most important of the various categories of myth is the myth of 'fertility'. Rabindranath Tagore, Madhusudan Dutt, Jivananda and Buddhadev Bose have used myth very carefully in their literature. Buddhadev Bose's first myth-based drama was 'Tapaswi O Tarangini'. The play takes into account the legend of the Indian Puranas, the drought ridden Angadesh, the advent of the sage and his credit in making the princess accepting water; which becomes the mythical backdrop to the play. The myth that is hidden in this story is that the union of men and women is the source which will bring down the rain and 'Bashundhara' or the Earth will be filled with grains; which is a primitive fertile component. Buddhadev Bose while retaining the main mythic structure has endowed the play with a modern relevance by exploring the psychological complexity of the characters and its significance in contemporary times.

Discussion

সাহিত্যে মিথের ব্যবহারের বিষয়টি তত্ত্বগত ভাবে বহু তাত্ত্বিক বহুভাবে দেখিয়েছেন। কিন্তু সকলেই হয়তো একমত হবেন ম্যালিনস্কির এই ভাষ্যের সঙ্গে - 'Myth is thus a vital ingredient of human civilization.' এ তো শুধু কোনো কাহিনী নয়, ধর্ম নয়, সংস্কার নয়, সাহিত্য নয়; তবে সামাজিক বিবর্তনকে বুঝতে, ব্যক্তিক ও সামাজিক মানস বিবর্তনকে জানতে, জীবন দুর্জয় রহস্যকে উপলব্ধি করতে কিংবা নির্মাণ করতে কোনো কাহিনী বা সৃষ্টি করতে কোনো যোগাযোগমুখী সাহিত্য কিংবা বার্তাযোগ্য কোনো শিল্প মিথ প্রত্যক্ষ বা অপত্যক্ষ গুরুত্বপূর্ণ বা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে। এমনই বৃহৎ এর ব্যাপ্তি যে, বিজ্ঞান অথবা দর্শন, ধর্ম কিংবা রিচুয়াল, সাহিত্য অথবা মনস্তত্ত্ব, আখ্যান কিংবা সমাজ ব্যাখ্যানে তাই অপরিহার্য হয়ে ওঠে মিথ। আর সাহিত্যের কাছেও তো গভীরভাবে প্রত্যাশী আমরা কালের সূত্র ধরে সমকাল, সমকাল অস্থিত মানুষ, মানুষের মনস্তত্ত্ব, প্রজন্ম প্রবাহ কিংবা দ্বন্দ্বিকতা, লোকজ্ঞান, সমষ্টি চেতন্য থেকে ইতিহাস কিংবা সমাজবিজ্ঞান অথবা অর্থনীতির সবকিছুই তো নিবিড় সংমিশ্রণে বহুতে এক হয়ে ওঠে সাহিত্যে। 'লুডভিগ ফায়ার অ্যান্ড দি এন্ড অফ



ক্লাসিকাল জার্মান ফিলজফি স্টেট', ১৮৮৮-তে এঙ্গেলস সঙ্গত মন্তব্য করে লিখেছিলেন যে, আর্ট অন্যান্য তত্ত্ব তথা রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক তত্ত্ব থেকে সমৃদ্ধ ও অস্বচ্ছ এবং আমরা বুঝতে পারি এই তথাকথিত অস্বচ্ছতা এর (শিল্পের) সমৃদ্ধতার কারণ।

বৈজ্ঞানিক যুক্তির অপ্রতুলতায় প্রাচীন মানুষ প্রাকৃতিক ঘটনাকে দৈবশক্তি মনে করে তাকে সম্ভ্রষ্ট করার জন্য দৈবী মিথের জন্ম দিয়েছে। আবার প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে মানুষ তাদের আদিপুরুষ বা প্রপিতামহের বীরত্ব, অভিযান নিয়ে কাহিনী শুনেছে, কনিষ্ঠদের শুনিয়েছে, ফলে এই বীরপুরুষেরাও মিথিক্যাল চরিত্র হয়ে গেছে। স্বভাবতই সত্য ঘটনার সঙ্গে কল্পনা মিশে গেছে। ইলিয়াড, ওডিসি, রামায়ণ, মহাভারতের প্রধান চরিত্রগুলির ঐতিহাসিক অস্তিত্ব এককালে সত্য ছিল। পরে নানা রঙে ভূষিত হয়ে ঈশ্বরত্বে পৌঁছল। আবার, সূর্য, আগুন, জল সবই দেবতায় পরিণত হল। কাল্পনিক দেবতাদের সম্ভ্রষ্ট করার জন্য যেসব অনুষ্ঠান বা ক্রিয়াদি, ধর্মের লৌকিক দিক যেমন পূজা, মন্ত্রপাঠ ইত্যাদি। লেজেভারি বীরেরা আবার মানব থেকে মহামানব, ক্রমে দেবতা হয়ে গেছেন। তারাও পূজা পেতে লাগলেন। মিথকে বিশেষ কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। তার মধ্যে সবথেকে প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ হল 'উর্বরতা' মিথ। কারণ প্রাচীন যুগে প্রকৃতি ও জীবজন্তুর সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকার ছিল সবচেয়ে বড় কথা। তার সঙ্গে বংশ বিস্তারও চাই দল বাড়ানোর জন্য। তাছাড়া কৃষিসভ্যতার বিকাশের সঙ্গে খাদ্য আহরণের সুবিধার জন্য নানা পূজাবিধি দেখা দিয়েছে বেশি ও অনায়াস ফলনের জন্য।

বহিরঙ্গে কাব্য এবং অন্তরঙ্গে দ্বন্দ্ব কাব্যনাট্যের পরিচয়। বাংলা সাহিত্যে কবিতার প্রভাব সুগভীর। সেই জন্য সংলাপ রচনায় কবিতা ব্যবহার হয়েছে বহুকাল। পৌরাণিক নাটকে অধিকাংশ আবেগ বহন করে কবিতা। আধুনিক যুগেও নাটক লিখতে কবিতার আঙ্গিক নিয়েছেন বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে প্রমুখ কথাকোবিদ। তবে রবীন্দ্রনাথ প্রায় সব শাখার মতো এখানেও পথিকৃৎ। তিনি কবিতা ও নাট্যাংশ এমনভাবে মিশ্রিত করেছেন যে কেউই কারো মর্যাদা ভঙ্গ করেনি। দুইয়ে মিলে এক হয়ে উঠেছে। বাংলা কাব্যনাট্যে কয়েকটি মিথিক্যাল চরিত্র বার বার এসেছে। কর্ণ, কৃষ্ণ, অর্জুন, কখনও একসঙ্গে কখনও বিচ্ছিন্নভাবে এদের পাওয়া যায়। বিভিন্ন কবির দ্বারা এদের যে ভিন্নতর মাত্রা পাওয়া যায় তাদের মধ্যে একটি বিবর্তনের ধারা দেখা যায়। লিখিত পুরাণ কাহিনী বা পুরাণের পূর্ব যুগের পুরাণের বীজ স্বরূপ লোকশ্রুতি নির্ভর গল্প-কাহিনীগুলিকে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা মিথ বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্যসৃষ্টি' প্রবন্ধে সেগুলিকে বলেছেন 'আদিম পুরাণ কথা'। কিংবদন্তীমূলক ইতিবৃত্ত ও কল্পনামিশ্রিত কাহিনীর সঙ্গে ঐ মিথগুলির পার্থক্য আছে। রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণকুন্তীসংবাদ' নাট্য-কাব্যের কর্ণের ভাষায় ঐ কাহিনীগুলি 'পুরাতন সত্য'। অলৌকিকতার মধ্যেও সেখানে উপস্থিত রয়েছে আবহমানকালের মানব জীবনের সত্যরূপ। সেইসব আখ্যানে অলৌকিকতার বিন্যাসটি সাক্ষাতিকভাবে। সেই সন্ধেতগুলির মর্ম উদ্ধার করলে উক্ত চিরকালীন জীবনসত্যের রূপ বোঝা সম্ভব হয়।

যাঁরা পুরাণের পুনর্জন্মদাতা কবি ও নাট্যকার তাঁরা কিম্বা পুরাণের ব্যবহারকারী অন্যান্য শিল্পীগণ লিখিত পুরাণ কাহিনীকেই নবযুগের পটে পুনর্লিখিতভাবে প্রকাশ করেন। সেক্ষেত্রেও পুরাণের পুনর্জন্ম ঘটিয়ে তাঁরা শিল্পসৌন্দর্য এবং চিরন্তন মানবরস একযোগে সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। পুরাণ রসের সঙ্গে যুগচৈতন্য এবং শিল্পীর আত্মচেতনার রঙ মেলে সেই রচনায়। রোমক কবি ওভিদের 'The Heroides Or Epistle Of The Heroines' কিম্বা মধুসূদনের 'বীরঙ্গনা' সেই ধরনের সৃষ্টি। যুগধর্মের ভাগিদে পুরাণের পরিবর্তন সেখানে করা হয়েছে। কিন্তু পুরাণের কাহিনীর পট পরিবেশ ঘটনা ও চরিত্রের মাত্রা সেখানে কবি যথাসম্ভব বজায় রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'কাহিনী' কাব্যের 'কর্ণকুন্তী সংবাদ', 'গান্ধারীর আবেদন', 'পতিতা' প্রভৃতি সেই ধরনের রচনা। কিন্তু কোনো কোনো রচনায় শিল্পী পুরাণ কাহিনীর অন্তরালে আদিম পুরাণের সত্য বা মিথ কাহিনীর আবিষ্কার করতে চান। আপন রচনাকে চান সেই পুরাতন সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলতে। রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' কাব্যের 'অহল্যার প্রতি' কবিতাটি সেই ধরনের কাব্যসৃষ্টি। এই ধরনের মিথ-পুরাণের উপাদান বা অনুষ্ণ ব্যবহারকে বিশেষভাবেই মনস্তাত্ত্বিক রচনাক্রিয়া বলা যায়। মিথ-পুরাণের ব্যবহার এখানে আখ্যানধর্মী হয় না, হয় প্রতীকধর্মী।

আধুনিক মনস্তত্ত্বের ভাষায় তাকেই বলা যায় প্রাচীন মিথ-পুরাণের 'আর্কেটাইপ্যাল' রূপ রচনা। একজন আধুনিক কবি বা শিল্পী তাঁর আদর্শ বা স্বপ্নকামনা কিম্বা অচরিতার্থ বাসনার প্রকাশ দেখেন জগতের প্রাচীন মিথ পুরাণের



কাহিনীগুলিতে। ফ্রয়েড তাঁর ‘The Relation Of The Poet To The Day-Dreaming’ বিষয়ক আলোচনায় বিষয়টি আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। ফ্রয়েড কথিত শিল্পীর দিবাস্বপ্ন প্রতিম সৃষ্টি প্রক্রিয়ার সঙ্গে রবীন্দ্র-সৃষ্টিকে মেলানো যাবে না। কিন্তু ফ্রয়েডের বক্তব্যের সারমর্ম দিয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে রবীন্দ্র সৃষ্টি সমীক্ষাও সম্ভব বা সম্ভব বুদ্ধদেব বসুর মত একজন আধুনিক শিল্পীর মিথ-পুরাণ-সন্ধানী চিত্তবৃত্তির বিশ্লেষণ। অমলেন্দু বসু তাঁর ‘সাহিত্যচিন্তা’ গ্রন্থে বলেছেন -

“শিল্পী জগৎ ও জীবনকে যেভাবে দেখতে চান বাস্তব জীবনে তিনি সব সময় সেই কল্পনার লীলার প্রতিরূপ দেখতে পান না তাই তো বাস্তবকে মিথের কল্পজগতে অনুপ্রবিষ্ট করে দেখতে চান বা ভিন্নভাষায় তিনি তাঁর কল্পনাগুলিকে মিথ-পুরাণের বাস্তব সত্যের পটে প্রতিফলিত করেন কিম্বা কল্পনাগুলিকে এক নতুন বাস্তবতায় রূপায়িত করেন। তার ফলেই এই ধরনের রচনাগুলিতে কেবল পুরাণের পুনর্জাগরণ হয় না- মহাকাল বা বিশ্বনিয়তির প্রেক্ষাপটটিও হয় সেই সঙ্গে রচিত-আর শিল্পীর সৃষ্টিলীলাটিও দিবাস্বপ্নের পরিধি ছাড়িয়ে বিশ্বজনীন জীবনস্বপ্ন হয়ে ওঠে।”^২

বুদ্ধদেব বসুর প্রথম মিথ নির্ভর নাটক ‘তপস্বী ও তরঙ্গিনী’-র প্রাথমিক রূপটি পাওয়া যায় তাঁর ‘মরচে পড়া পেরেকের গান’ কাব্যগ্রন্থে। ঐ সংকলনে ঐ একই শিরোনামে অর্থাৎ ‘মরচে পড়া পেরেকের গান’ কবিতায়। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে বিভ্রান্ত করে অঙ্গদেশে নিয়ে আসা হলে তার উপস্থিতির ফলে খরায় বিগুঞ্চ দেশ বর্ষান্নাত হয় এবং আবার ফুলে-ফলে-ফসলে ভরে যায়। রাজকন্যা শান্তার সঙ্গে তার বিবাহ হলে তিনি নিজের আশ্রমে পিতা বিভাঙ্কের কাছে সস্ত্রীক ফিরে যান। এই কাহিনী আমরা পাই ‘রামায়ণে’, ‘মহাভারতে’। এই কাহিনী নিয়ে প্রথম লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ‘পতিতা’ কবিতায়। ভারতীয় পুরাণবৃত্তের এই স্বল্পখ্যাত কাহিনীকে বুদ্ধদেব গ্রহণ করেছিলেন বস্তুতপক্ষে তাঁর নিজের মিথচর্চার আঘোঘাটনের আকাঙ্ক্ষায়। তিনি লিখেছেন -

“একটি পুরাণকাহিনীকে আমি নিজের মনোমত করে নতুনভাবে সাজিয়ে নিয়েছি, তাতে সঞ্চর করেছি আধুনিক মানুষের মানসতা ও দ্বন্দ্ববেদনা। বলাবাহুল্য এ ধরনের রচনায় অন্ধভাবে পুরাণের অনুসরণ চলে না। কোথাও কোথাও ব্যতিক্রম ঘটলে তাকে ভুল বলাটাই ভুল। আমার কল্পিত ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিনী পুরাকালের অধিবাসী হয়েও মনস্তত্ত্বে আমার সমকালীন।”^৩

এই লেখার অনুপ্রেরণা তাঁর অল্পবয়সেই অর্জিত হয়েছিল। উত্তরকালে যখন তিনি তুলনামূলক পুরাণবৃত্তের চর্চায় গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তখন সেই বাল্যপ্রেরণা নতুন করে সঞ্জীবিত হয়ে উঠল এবং তারই লক্ষ্যফল এই নাটক। এই কাহিনীতে বুদ্ধদেব একই সঙ্গে মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসের কতগুলি চিরন্তন অভিজ্ঞতালব্ধ শাস্ত্র সত্যের পুনর্মূল্যায়ণ করেছেন; তেমনই আবার তারই সঙ্গে আধুনিককালের জীবনযাত্রার বিভিন্ন জটিল মিথক্রিয়ারও সহাবস্থান ঘটিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে এই নাটকে এমন কিছু মৌলিক প্রশ্নকে তিনি বিচার করতে চেয়েছেন, যারা একই সঙ্গে চিরায়ত ও অধুনাতন। রামায়ণ, মহাভারত ও দুটি জাতকে ঋষ্যশৃঙ্গ উপাখ্যান যেমন ভাবে বর্ণিত আছে, তাদের মধ্যে মোটামুটি ভাবে কাহিনীগত পার্থক্য খুবই কম। ফলে একটি প্রত্নপ্রতিমাই প্রায় অপরিবর্তিত ভাবে সর্বত্র ব্যবহৃত। বিভাঙ্ক মুনি ও শাপগ্রস্তা হরিণীরা আদিত্যকন্যা স্বর্ণমুখর পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ। পুরাণ কথায় বলে হরিণীজাতক বলে তাঁর মাথায় দুটি শৃঙ্গ ছিল, সেজন্যেই বিভাঙ্ক পুত্রের ঐ নাম। যৌবনাবধি তিনি নিজের পিতা ছাড়া আর কাউকে প্রত্যক্ষ করেন নি। তপস্যা ও বেদ অধ্যয়নে দিন কাটিয়েছেন। অন্যদিকে অঙ্গরাজ লোমপাদের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে ব্রাহ্মণরা সে দেশ ছেড়ে চলে যান এবং তাদের নির্বন্ধে দেবরাজ মেঘবাহন ইন্দ্র সেখানে বৃষ্টি পড়া বন্ধ করে দেন। অন্তত লোমপাদ ঋষিদের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করলে তারা বলেন যে, ঋষ্যশৃঙ্গের কৌমার্য বিসর্জন দেওয়াতে পারলে আবার অঙ্গদেশ সুজলা-সুফলা হবে। তাদের প্ররোচনায় রাজা কয়েকজন পরমা সুন্দরী বারবণিতাকে বিভাঙ্কের আশ্রমে পাঠান। পিতার সাবধানবাণী সত্ত্বেও ঋষ্যশৃঙ্গ তাদের একজনের রূপযৌবনের মোহে পড়ে আশ্রম ছেড়ে চলে আসেন অঙ্গরাজ্যে এবং সে দেশ সুজলা-সুফলা হয়ে ওঠে। দশরথের কন্যা শান্তাকে রাজা লোমপাদ নিজের কাছে রেখে লালন পালন করতেন। তার সঙ্গে বিভাঙ্কের পুত্রের বিয়ে দেওয়া হয় এবং শান্তা পুত্রবতী হলে পিতার নির্দেশে ঋষ্যশৃঙ্গ আবার আশ্রমে ফিরে যান।



মোটামুটি ভাবে এই পৌরাণিক কাহিনীকে বুদ্ধদেব অক্ষত রেখেছেন সামান্য কিছু অদল-বদল করে। লোকেরা যাকে ‘কাম’ নাম দিয়ে নিন্দে করে থাকে, তারই প্রভাবে দু-জন মানুষ পুণ্যের পথে নিষ্ক্রান্ত হলো-নাটকটির মূল বিষয় হল এই। ঋষ্যশৃঙ্গের সংস্পর্শে এসে বারাজনা তরঙ্গিনীর যে ভাবান্তর ঘটেছিল, তার পূর্বসূত্র অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের ‘পতিতা’ কবিতা। কিন্তু এই কাহিনীতে ঋষ্যশৃঙ্গের যে মোটামুটি ফসিস, সেটা সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধদেবের নিজের অনুভাবনা। হৃদয়ের মধ্যে ভালবাসা জেগে উঠলে বারাজনাও যে তার গ্লানিময় জীবনের উর্ধ্বে নিজের অন্তরের গভীরে আপন সত্তাকে পবিত্রতার প্রতিমারূপে অনুভব করে, এমন কাহিনীর সন্ধান বিশ্বসাহিত্যে সুপ্রাচীনকাল থেকে এ অবধি অজস্রবার আমরা পেয়েছি। বাইবেলের গল্পে আছে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর পদতলে উপবিষ্টা রোমান সৈনিকদের একদা প্রমোদসঙ্গিনী মেরী মাদলীনের পতিতা থেকে প্রেমিকায় উন্নীত হওয়ার অপরূপ করুণ রোমান্টিক বৃত্তান্ত। ‘resurrection’ সেখানে শুধু যীশুরই হয়নি, তারও ঘটেছিল। এই মিথ নিয়ে এক অনবদ্য উপন্যাস ‘লাস্ট টেম্পটেশন অব যিশাশ’, তারও আগে লিও টলস্টয় লিখেছিলেন এইরকমই এক বারাজনার উত্তরণের কথা তাঁর বিখ্যাত ‘রেজারেকশান’ উপন্যাসে। শরৎচন্দ্রের ‘শ্রীকান্ত’ উপন্যাসের রাজলক্ষ্মী কিংবা ‘আঁধারে আলো’র বিজলীর মতো চরিত্রগুলি তো বহুল পরিচিত। এসবই হয়তো বুদ্ধদেবকে কমবেশি অনুপ্রাণিত করেছিল, তরঙ্গিনীর মতো একটি চরিত্রকে গড়ে তুলতে। এই মিথ যে তাঁর মনের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে সৃষ্টির জন্যে উপকরণ সঞ্চয় করেছিল, সেকথা তিনি নিজের স্মৃতিকথা ‘কবিতা ও আমার জীবন’ (কবিতার শত্রু ও মিত্র)-এ লিখেছেন।

বুদ্ধদেব বসু দীর্ঘকাল ধরে মিথের একটি অতি প্রাচীন উপজীব্য নিয়ে মগ্ন ছিলেন যা তাঁর কাজের মধ্যে বারবার নানা মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। খৃস্টীয় ‘হোলি গ্রেইল’ উপাখ্যানের কথা বুদ্ধদেব নিজেই লিখেছেন ‘মরচে পড়া পেরেকের গান’ কবিতার মুখবন্ধে। কিন্তু শুধু এটাই নয়। এই কাহিনীর মধ্যে যে মিথ লুকিয়ে আছে, তার উৎসে রয়েছে উর্বরতাকেন্দ্রিক আদিম ধর্মধারার অনুষ্ণ। নারী ও পুরুষের মিলনের ফলে বৃষ্টি নামবে, বসুন্ধরা তৃণে শস্যে পরিপূর্ণ হবে এই ধারণা পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন সংস্কৃতিবলয়ের মানুষের মনেই সঞ্চিত আছে স্মরণাতীত কাল থেকে। এই ভাবনাকে কেন্দ্র করে অজস্র ধর্মাচার সর্বত্রই প্রচলিত আছে। ‘হোলি গ্রেইল’ মিথই হোক আর ঋষ্যশৃঙ্গ মিথই হোক, সেটি তারই রূপান্তর। মিথ এবং রিচুয়ালের মধ্যে এই নিবিড় সম্পর্কের কথা বহু লোকপুராণবিদই বিশ্লেষণ করে বুঝিয়েছেন, যেমন - লিলিয়ান ফেভার ‘এনসেন্ট মিথ অ্যান্ড মডার্ন পোয়েট্রি’, জেন অ্যালেন হ্যারিসন ‘থেমিস’, ই.ও. জেমস ‘মিথ অ্যান্ড রিচুয়াল টু রোমান্স’, ক্লোড লেভি-স্ত্রোস ‘স্ট্রীকচারাল অ্যানথ্রোপলজি’ প্রভৃতি। বুদ্ধদেবের পুরাণ অন্বেষণের যেদিকটির কথা একটু আগে বলেছি তারও শিকড় ঠিক এইখানেই নিহিত রয়েছে, যার অসামান্য অভিব্যক্তি আমরা লক্ষ্য করেছি ‘শীতরাত্রির প্রার্থনা’ কবিতায়। অন্তহীন দ্রৌপদীর শাড়ির সঙ্গে পৃথিবীতে অফুরন্ত প্রাণের পুনরুজ্জীবনের যে তুলনা তাঁর মিথভাবনাকে অজস্রবার অনুপ্রাণিত করেছে, সেইটিরই সংহততর নাট্যময় অভিব্যক্তি হল ‘তপস্বী ও তরঙ্গিনী’র অন্তর্লীন এই ভাবরূপটি। রামায়ণ-মহাভারতের মিথ এখানে একটি আংশিক মাধ্যম মাত্র। বস্তুত মিথটি সৃষ্টির অনবচ্ছিন্নতা-নির্ভর প্রাচীনতর যে আদিপুরাণকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছিল, বুদ্ধদেবের মূল প্রেরণা সেটিই।

দ্রৌপদীর শাড়ি কিংবা নল-দময়ন্তীর কাহিনী প্রভৃতি যেসব প্রসঙ্গ তাঁকে বারবার অনুপ্রাণিত করেছে, সেটিরই সংহত অনুধ্যান ঘটেছিল ‘শীতরাত্রির প্রার্থনা’য় আর সেখানে একই সঙ্গে নানা দেশের মিথভাবনার সংশ্লেষণ হয়েছিল যে তা আমরা আগেই দেখেছি। এই অন্তর্কাঠামোর ওপরেই নির্মিত হয়েছে প্রথমে ‘মরচে পড়া পেরেকের গান’ কবিতা এবং পরে ‘তপস্বী ও তরঙ্গিনী’ নাটকের বহিঃরঙ্গ। পৌরাণিক কাহিনী থেকে যেখানেই ‘তপস্বী ও তরঙ্গিনী’ নাটক সরে গেছে, সেসব ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক আকর্ষণ-বিকর্ষণের বিষয়টি হয়ে উঠেছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পৌরাণিক কাহিনীতে তরঙ্গিনীর প্রলোভনে ঋষ্যশৃঙ্গের কৌমার্য বিসর্জনের ব্যাপারটি সাধারণভাবে উল্লিখিত আছে মাত্র। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, তরঙ্গিনী এবং লোলাপাসী নাম দুটি পুরাণে নেই। যেমন নেই শান্তার প্রেমিক অশ্বমানেও কোনো উল্লেখ। প্রকৃতপক্ষে পুরাণের কাহিনীটি সম্পূর্ণরূপেই উর্বরতাকেন্দ্রিক ধর্মাচারের একটি পরিশীলিত বিবরণমাত্র। সেই কাহিনীকে বুদ্ধদেব দীর্ঘদিন ধরে নিজের মনের মধ্যে ধীরে ধীরে বিকশিত করে তুলেছিলেন, খেহেতু ঐ বিশেষ রিচুয়াল নির্ভর মিথগুলি তাঁর মানসিকতার সঙ্গে সুসামঞ্জস্য হয়েছিল সহজভাবেই। কিন্তু যখন তিনি ঐ মিথকে এই নাটকের মাধ্যমে সাজিয়ে-গুছিয়ে শিল্পবস্তু করে তুললেন,



তখন স্বভাবতই তার মধ্যে অনেক কিছু সংযোজনের প্রয়োজন দেখা দেয়। যার সূত্রে অংশমানের সৃষ্টি করা হল, শান্তা এবং অংশমানের প্রণয়ের উপকাহিনী তৈরি করে নাটকের প্লটকে জটিল করে তোলা হল এবং ঋষ্যশৃঙ্গ, তরঙ্গিনী, শান্তা ও অংশমানকে নিয়ে যে মানসিক আকর্ষণ-বিকর্ষণের টানাপোড়েন দেখানো হল, তা প্রাচীন মিথের মধ্যে কখনোই প্রত্যাশিত ছিল না।

ঐ মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার রূপায়ণের কারণেই মূল মিথের কাঠামোটি মোটামুটি আনুপূর্বিকভাবে বজায় রেখেও বুদ্ধদেব যা সৃষ্টি করেছেন, তা হয়ে উঠেছে একটি একাল সুলভ নাটক। সেখানে প্রাচীন মিথের যৌথ জীবন যাত্রার অলঙ্ঘ্যপ্রায় অভ্যাসকে অতিক্রম করে পুরোনো নামের আড়ালে একালীন কয়েকজন তরুণ-তরুণীকেই যেন বুদ্ধদেব রূপায়িত করেছেন। এমনকী সন্তানবতী শান্তাকেও তার কৌমার্য প্রত্যর্পণ করার মধ্যে মিথীয় অলৌকিকতার পরিবর্তে একালের সামাজিক জীবনচর্যারই প্রতিফলনটি যেন বেশি গাঢ় রঙে অঙ্কিত বলে অনুভব করা যায়। তরঙ্গিনীকে ধরে না রাখতে পেরে চন্দ্রকেতু এবং লোলাপাসীর মধ্যে যন্ত্রণার অংশীদারীত্ব বন্টন করে নেওয়ার মাধ্যমে দুজনে একত্রে দিন কাটানোর যে পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি উচ্চারিত হয়েছে কাহিনীর শেষে, সেটিও অত্যন্ত দুঃসাহসিক এবং আধুনিকতা, যা মূল মিথে নেই, থাকার কথাও না।

রাজপুরোহিত শেষ দৃশ্যে মন্তোচ্চারণের মতো যে কথাগুলি আবৃত্তি করেছেন, এখানে সেটিও একান্তভাবে অনুধাবনযোগ্য-

“কিন্তু এই চক্র থেকে নিষ্ক্রান্ত হল দু’জনে
অলক্ষ্য পথে, আত্মবশ, নিঃসঙ্গ;
তাদের ভূমিকা আজ বিচূর্ণিত ঘট, ঘটনার অধীন তারা নয় আর-
এক তপস্বী যুবরাজ, এক বারাসনা প্রেমিকা।”^৪

রোমান্টিক প্রেম, জৈবিক আকর্ষণ এবং অমোহিত নিরাসক্তি এই তিনটি পরস্পর-অলগ্ন বলে স্বীকৃত প্রবৃত্তির গ্রন্থিবন্ধন যে একই ঘটনার মধ্যে ছিল, এমন একটি জটিল ঘটনা সৃষ্টি করে বুদ্ধদেব এই কাহিনীকে যতই মিথীয় রেখেছেন, তার চেয়ে ঢের বেশি মনস্তাত্ত্বিক করে তুলেছেন। আর সেই বিশেষ মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হৃদয়টাই এই নাটকের মিথের বন্ধনকে ভেঙে ফেলে বহুদূর নিয়ে চলে গেছে, হয়তো বা ঋষ্যশৃঙ্গ কিংবা তরঙ্গিনীর মতই কোনো এক অনির্দেশ্যের সন্ধানে।

‘তপস্বী ও তরঙ্গিনী’ নাটকের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেবের অনূদিত একটি জাপানী ‘নো’ (knoh) নাটক ‘ইক্কাকু সেন্নিন’-এর কথাও কিছুটা আলোচনার দাবি রাখে। কোমপারু মোতাআসু রচিত মূল জাপানী নাটকটিকে এই ঋষ্যশৃঙ্গ মিথেরই দেশান্তরিত একটি রূপ হিসেবে ধার্য করেছেন বুদ্ধদেব। এই ‘নো’ নাটকটিতেও দেখানো হয়েছে যে এক তপস্বীকে রূপমোহে আকৃষ্ট করে ফেলল কোনো সুন্দরী নারী এবং তারই পরিণামে নামল প্রবল বর্ষণ। স্পষ্টতই ঋষ্যশৃঙ্গ মিথ আর এই নাটক একই ভাবনার আর্কিটাইপ বা প্রত্নপ্রতিমা থেকে উৎসারিত। ঋষ্যশৃঙ্গ-পুরাণের প্রবাসী এবং রূপান্তরিত সংস্করণটিই যে ইক্কাকু কাহিনী, তার একটি উল্লেখযোগ্য সূত্র হচ্ছে এই কাহিনীর শেষদিকে বারাগসীধামের উল্লেখ রয়েছে। অনাবৃষ্টি দূর করতে নারী পুরুষের মিলন এবং তার পরে বৃষ্টিপাতের এই অংশটুকুকে যদিও বা বিশ্বজনীন উর্বরতা-তাত্ত্বিক মিথ-রিচুয়ালের জাপানী উর্ধ্বতন বলে মনে করা হয়, তাহলেও, ‘এরই মধ্যে তাঁরা পৌঁছে গেছেন রাজসভায়, বারাগসীধামে’ - নাটকের কোরাসের এই উক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করে এর ভারতীয় উৎসজাতকে। বুদ্ধদেব ‘ইক্কাকু’ নামটিকেও ‘একশৃঙ্গ’ নামের রূপান্তর বলেই গণ্য করেছেন। মূল মহাভারতের ঋষ্যশৃঙ্গও একশৃঙ্গধারী ছিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনীটি উর্বরতা বিষয়ক ভাবনার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই নাটকে উর্বরতা বিষয়ক ভাবনাকে আরো ব্যাপকভাবে মূর্ত করে তোলা হয়েছে। ব্রাহ্মণকে অপমান করা হয়েছে। সূচনাতে রাজপ্রসাদের সংলগ্ন পথে গাঁয়ের মেয়েদের কোরাস আবৃত্তিতে সৃষ্টির ধারাকে সচল রাখতে আকুল আবেদন শোনা গেছে -

- (১) “ধান আর সোনার সন্তান মায়ের কোলে”^৫
- (২) “অগ্নিতে আর জলের মিতালিতে অমৃত স্বাদ পায় অন্ন”^৬
- (৩) “জননী বসুমতী ভুলো না আমরাও তোমারই গর্ভের পরিনাম”^৭



- এই ধারণা ও আক্ষেপ ও সৃষ্টির জন্য প্রার্থনা বৃষ্টির, বীর্যের -

“হে দেব, ঐরেশ! মহান! মঘবান! এবার দয়া করো, বৃষ্টি দাও-
 বৃষ্টি দাও!”^৮

বৃষ্টিহীনতার প্রত্যক্ষ কারণ উঠে এসেছে রাজপুরোহিতের মুখে-

“অক্ষম আজ অঙ্গরাজ, বীর্য তাঁর নিঃশেষ
 শুষ্ক তাই মৃত্তিকা, রিজ্ঞ নভোতল।

রাজার যৌন অক্ষম-তাই রাজ্যের সার্বিক অনুর্বরতার হেতু।”^৯

এই অঙ্গরাজ ‘ওয়েস্টল্যান্ড’-এর ফিসার কিং-এর তুল্য। ফিসার কিং পুরাণ কাহিনীতে বলা হয়েছে - রাজা যৌন ক্ষমতা হারিয়েছেন বলে রাজ্য অনুর্বর হয়ে গেছে। ফসল জন্মায় না, সবাই প্রজনন শক্তি রহিত। এই অনুর্বরতার অভিশাপ থেকে ত্রাণ করতে পারেন একজন তরুণ নাইট যিনি গ্রেইল চ্যাপেল পর্যন্ত পৌঁছতে পারবেন। তাকে নানা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে এবং ল্যান্স ও কাপ-এর মর্মার্থ নিরূপণ করতে হবে। যদি তিনি সফল হন তাহলে রাজা তার উর্বরতা ফিরে পাবেন এবং রাজ্যের উর্বরতা পুনঃসংস্থাপিত হবে। খৃষ্টীয় ল্যান্স ও কাপ প্যাগান ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত। কাপ ও ল্যান্স হচ্ছে স্ত্রী ও পুরুষের যৌন চিহ্নের প্রতীক এবং সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঙ্গে যুক্ত আছেন উর্বরতার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এটিস, ওসিরিস ও এডোনিস। ফিসার কিং-এর খরাগ্রস্ত রাজ্যের অনুরূপ চিত্র দেখিয়েছেন ইলিয়ট। তার ওয়েস্টল্যান্ড পৌরাণিক রাজার অনুর্বর রাজ্যেরই প্রতিচ্ছবি। সেই পৌরাণিক রাজা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মিথের ব্যাখ্যাতা জেসি. এল. ওয়েস্টন বলেছেন-

“In the Grail King we have a romantic literary version of that strange mysterious figure whose presence hovers in the shadowy background of the history of our Aryan race; the figure of a divine or semi divine ruler, at once god and king, upon whose life and unimpaired vitality, the existence of his land and his people directly depends.”^{১০}

‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী’র অঙ্গরাজও তেমনি একজন রাজা যার অদৃষ্ট উর্বরতার উপরই সাক্ষাৎ নির্ভর করে তার রাজ্য ও জনগণের অস্তিত্ব। বিপরীতভাবে বলা যায়, তার উর্বরতা ক্ষয় হয়ে গেলে তার রাজ্য ও জনগণের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। নাটকে তো তাই দেখা যাচ্ছে। পুরোহিত বলেছেন, - “রুদ্ধ তাই ঋতু, নেই শস্য, গোবৎস ও সন্তান।”^{১১} গ্রাম থেকে আগত মেয়ে ও রাজদূতের কথাবার্তায় সর্বব্যাপী অমঙ্গলের কথাই বার বার শোনা যাচ্ছে। জেসি. এল. ওয়েস্টন উল্লেখ করেছেন, জলস্রোতের মুক্তি (Freeing waters) দ্বারা পৌরাণিক কাহিনীতে জীবনের প্রতিষ্ঠা ও শস্যদেবতার পুনরুজ্জীবন (affirmation of life and the rejuvenation of the vegetation God) বোঝানো হয়। অর্থাৎ জলের মুক্তির দ্বারা এই প্রতীকীভাবে অনুর্বরতার অবসান সূচিত করা হয়। ইলিয়টও ওয়েস্টল্যান্ডে বছবার জলের উল্লেখ করেছেন, রুদ্ধস্রোত গঙ্গার কথা বলেছেন। বুদ্ধদেবও বলেছেন জলস্রোতের মুক্তির কথা। পুরোহিত বলেছেন -

“আদি উৎস জল। একই স্রোত অন্তরীক্ষে ও ভূতলে,

ঔরসে, ও বৃষ্টিতে, নিব্বরিণী ও নারীগর্ভে;

জন্ম দেয় জল, অন্ন জল, জাগে প্রাণস্পন্দন ও প্রেরণা।

ব্যাহত সেই প্রবাহ, আর্ত আজ নিখিল।

একদা বৃত্র বন্দী করেছিলো জলরাশিকে,

যেমন সার্থবাহকে স্তম্ভিত করে দসুরো;

বন্দ্যায় স্তন ও কৃপণের ধন যেমন নিষ্ফল,

তেমনি ছিলো জল, নিশ্চল, কন্দরে।

কিন্তু জলকে মুক্তি দিলেন ইন্দ্র, ধ্বংস হল অসুর তাঁর বজ্রে,

দীর্ঘ হলো পর্জনা, সপ্তসিন্ধু প্রবহমান;

যেমন গোষ্ঠ থেকে গাভীরা, গুহা থেকে নিষ্ক্রান্ত হলো বৃষ্টি,

বর্ধিত হলো স্রোতস্বিনী, যেমন দ্যুতজয়ীর বিত্ত।



আজ অঙ্গদেশে আবার জল রুদ্ধ, তাকে মুক্তি দাও;
 স্থলিত করো বিদ্যুৎ-নিষ্কলঙ্ক, উজ্জ্বল;
 আনো বজ্রের মতো পৌরুষ, তীব্রতম যৌবন;
 খঙ্গ হোক উদ্ধত; বিকীর্ণ হোক বীজশ্রোত।”^{২২}

অঙ্গদেশে রুদ্ধশ্রোত জলের মুক্তি দিতে হবে, তবেই দীর্ঘ খরার অবসান হবে। উর্বরতা বিষয়ক সকল মিথেরই মর্মতলে রয়েছে মানুষের যৌন উর্বরতার কথা। অঙ্গরাজ্যের খরার অবসানের জন্য মুক্তি দিতে বলা হল ঋষ্যশৃঙ্গের বীজ শ্রোতের-

“কুমার - অপাপবিদ্ধ - ঋষ্যশৃঙ্গ - তরুণ
 ধ্বংস করো, ধ্বংস করো তাঁর কৌমার্য;
 রাজা যদি রিজু, তবে লুণ্ঠন করো তপস্বীকে;
 সিন্ধু হোক নারী ও পুরুষ, ব্যক্ত হোক মৃত্তিকার প্রতিভা।”^{২৩}

- কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গ কেন? শৃঙ্গ হচ্ছে যৌনশক্তির প্রতীক। ঋষ্যশৃঙ্গ এই যৌনশক্তির ধারক। তাই অনূর্বরতার অবসানের জন্য ঋষ্যশৃঙ্গের নির্বাচন খুবই যুক্তিসঙ্গত। ঋষ্যশৃঙ্গের চম্পায় আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই বর বর শব্দে বৃষ্টি নামল। অর্থাৎ প্রবল যৌনশক্তির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই প্রজননহীনতার অবসান হল। অনূর্বরতার মতো উর্বরতাও ব্যাপ্ত হল প্রকৃতি ও মানুষে।

দ্বিতীয় অঙ্কে ঋষ্যশৃঙ্গের কুটির প্রাঙ্গণের নেপথ্যে নারীকণ্ঠের সঙ্গীতে উচ্চারণ হয়েছিল -

“জাগো, সৃষ্টির আদি শিহরণ
 জাগো, বিষ্ণুর নাভিপদ্ম!
 করো ব্রহ্মার মতি চঞ্চল
 আনো দুর্বীর মায়াদ্বন্দ্ব

...

বাজো শূন্যের বুকে ওঙ্কার
 জাগো, বিশ্বের বীজমন্ত্র।”^{২৪}

দ্বিতীয় অঙ্কেই তরঙ্গিনী ও ঋষ্যশৃঙ্গের মিলন বর্ণনায় প্রকৃতি, মেঘ-বৃষ্টির অনুসঙ্গ এসেছে। এই, জীব-জীবন-আবর্তনের মূল সূত্রটি আশুন, বজ্র, বীর্য ও মেঘ-বৃষ্টির সম্মিলনের ধারাবাহিকতায় একটি নাটকীয় প্রেক্ষিতে পেয়েছে। বুঝেছি কীভাবে ‘একসূত্রে বাঁধা ভ্রুণ ও উদ্ভিদ, অন্তজ ও জরায়ুজ’।^{২৫} লক্ষণীয় জীব জগতের এই সূত্রটি প্রাকৃতিক, অবৈজ্ঞানিক নয়। কিন্তু বৃষ্টিহীন সময়ে রাজার শারীরিক বন্ধাত্ম নিবারণের সঙ্গে সঙ্গে আকাশ কালো মেঘের সঞ্চর ও বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের কোনো ব্যাখ্যা নেই। কিন্তু দূরগত একটি জৈবনিক যোগাযোগ বর্তমান এবং প্রতীকী মূল্য হিসাবে রাজা যদি অধীশ্বর হন সাম্রাজ্যের, তবে সাম্রাজ্যের অনাবৃষ্টির জন্য তাঁর অথবা বংশগত ভাবে অন্য কারো দায়িত্ব থেকে যেতে পারে - এমনতর বিশ্বাস, এধরণের মিথের একটি ব্যাখ্যা হতে পারে। মৃত্যু এবং পুনর্জন্ম-এর এই মিথ যাকে ফ্রেজারের কথায় ‘God of Vegetation’ বলা চলে, এর সঙ্গে স্বভাবতই মিশে থাকে Ritual, এই Ritual এর সরাসরি ব্যাখ্যা নাও থাকতে পারে। সেগাল যেভাবে বলেন- ‘Ritual may still be the application of myth, but myth is subordinate to Ritual’ আর মিথ আর রিচুয়ালের এই সম্পর্ক আসলে ‘The Combination of religion and magic’।^{২৬} এই জাদু কখনো বা অনুকৃতমূলক, কখনো সংস্পর্শমূলক কখনো তা শুভকারী কখনো বা অশুভকারী, কখনো পজিটিভকখনো নেগেটিভ। জাদুর বিশ্বাস আধিক্যে, সামাজিক মূল্যবোধে সমর্থিত নয়, এমন ঘটনাও সমাজ কর্তৃক সমন্বিত হয়। তখন এই জাদু বিশ্বাস একটি প্রতীক অনুষ্ঠানের রূপ নেয়।

ইলিয়ট ফিসার কিং-এর রাজ্যের অনূর্বরতাকে যুদ্ধব্রত, সঙ্কটতাড়িত, আধ্যাত্মিক সজীবতা রহিত, ক্লাস্তিকর দৈনন্দিন কর্মব্যস্ততার আধুনিক জীবনের পৌরাণিক সমান্তরাল হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। উর্বরতার কাহিনী, উর্বরতার



অনুষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ করেনি। রাজার পুনরুজ্জীবনকে তিনি স্থাপন করেছেন অমঙ্গল কবলিত বর্তমান জীবনের উদ্ধারের পটভূমিতে। নাইট হয়েছেন ধর্মীয়ার্থে আধ্যাত্মিকতার প্রতীক। অর্থাৎ, যুদ্ধোত্তর জীবনের ভয়াবহতা থেকে মানুষের মুক্তি আসতে পারে ধর্মীয় মূল্যবোধের আচরণের দ্বারা। এই হচ্ছে তার ওয়েস্টল্যান্ডের মুক্তিযুদ্ধ। বুদ্ধদেব বসু কি উর্বরতার কাহিনীকে ইলিয়টের মতো কোন জৈবনিক পটভূমিতে স্থাপন করেছেন। তবে উর্বরতামূলক এই কাহিনীর মধ্যে তিনি রোমান্টিক বিস্ময় ও আবেগ সংক্রামিত করেছেন। ঋষ্যশৃঙ্গ তরঙ্গিনীর ক্রমোর্ধ্বগামী মনোসম্পর্ক হচ্ছে এই কাহিনীর অন্য একটি পর্যায়। প্রেম সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে কামম্পৃষ্ট বলে মূল কাহিনীর সঙ্গে এর কোন শারীরিক বিচ্ছেদ নেই। বুদ্ধদেব উর্বরতার কাহিনীকে ধীরে ধীরে দুটি চরিত্রের স্পষ্ট জটিল অনুভূতি বিশ্লেষণের দিকে নিয়ে গেছেন এবং সেখানেই কাহিনীটি একটি দারুণ রোমান্টিক চরিত্র ধারণ করেছে এবং বুদ্ধদেবের মিথ প্রয়োগ সার্থক হয়েছে।

Reference:

১. Segal, R.A. (2006), *Myth : A Very Short Introduction*, Oxford University Press (Indian Edition), p. 27
২. বসু, অ, (১৯৫৯), সাহিত্যচিন্তা, সমালোচনার পদ্ধতি, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, পৃ. ৯৫
৩. বসু, ব, (১৯৬৬), তপস্বী ও তরঙ্গিনী, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ভূমিকা অংশ
৪. বসু, অ, (১৯৫৯), সাহিত্যচিন্তা, সমালোচনার পদ্ধতি, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, পৃ. ৯২
৫. তপস্বী ও তরঙ্গিনী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১
৬. পূর্বোক্ত
৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২
৮. পূর্বোক্ত
৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮
১০. Weston, J. L. (1920). *From Ritual To Romance*, Cambridge University Press, p. 58
১১. তপস্বী ও তরঙ্গিনী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮
১২. পূর্বোক্ত
১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯
১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১
১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮
১৬. *Myth : A Very Short Introduction*, পূর্বোক্ত, p. 67